স্বাধীনতা হারাবে। বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করবে, এসব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। জোটনিরপেক্ষ থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোলে এরা লাভবান হবে।

২২.৪ জোটনিরপেক্ষতা ও তৃতীয় বিশ্ব

বিশ শতকের দুদশকের মধ্যে দু-দুটি মহাযুদ্ধ ঘটে যায়, অনেক আশা নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করা হয়। কিন্তু জাতিপুঞ্জ বিশ্বে শান্তিরক্ষা করতে পারেনি। শান্তির স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষরা নানা পরিকল্পনার কথা ভেবেছিল। নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশবাদের অবসান, শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা, বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধিতা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা দান, জোটমুক্ত পৃথিবী গঠন ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ পরবর্তীকালের বিশিষ্ট নেতারা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন। জওহরলাল নেহরু মনে করেন দুই মেরুর বিশ্বে তৃতীয় দুনিয়ার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মহাশক্তিধর দেশগুলি দুর্বল ছোটো দেশগুলিকে জোটভুক্ত করে নিয়ে তাদের দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করবে। এসব দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির ধারা রুদ্ধ হয়ে পড়বে। পৃথিবী সাম্যবাদী ও পুঁজিবাদী এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা ও রাশিয়া যাতে মাঝারি ও ছোটো দেশগুলিকে প্রভাবিত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে সহায়তা দেন মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের, যুগোশ্লাভিয়ার টিটো, ঘানার নক্রুমা এবং ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বিশ্বরাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। দুই মেরুতে বিভক্ত পৃথিবী তিন মেরুতে পরিণত হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, পরে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিও এই আন্দোলনে শামিল হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোনো শিবিরে যোগ না দিয়ে ভারতকে নিরপেক্ষ রাখেন, দুই শিবিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, উভয় জোট থেকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য নেন। নেহরুর নির্জোট নীতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছিল আদর্শবাদ ও বাস্তব রাজনীতির (It was an admixture of idealism and realism)। স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতের অনেক জরুরি অভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল। ঠিক এই কারণে নেহরু বিশ্বরাজনীতির ঠান্ডা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাননি। তিনি মনে করেন নির্জোট আন্দোলনের মাধ্যমে দুই শিবিরের মধ্যে উত্তেজনা কমানো যাবে, বিবদমান দুই শিবিরের মধ্যে যুদ্ধ পরিহার করা সম্ভব হবে। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি একটি তৃতীয় শক্তিজোট হিসেবে বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমনে সহায়তা দেবে। ভারত বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রয়াস চালিয়ে যাবে। নিরস্ত্রীকরণ, আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তৃতীয় জোট মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করতে পারবে।

জওহরলাল নেহরু তাঁর নানা বক্তৃতায় জোটনিরপেক্ষ নীতির সারমর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন কোনো দেশ আক্রান্ত হলে, স্বাধীনতা পদদলিত হলে নিরপেক্ষরা আর নিরপেক্ষ থাকবে না। তারা আক্রান্তের পক্ষ নেবে। জোটনিরপেক্ষতা বিশ্বে বিরোধের ক্ষেত্র কমিয়ে আনার চেষ্টা করবে। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ২৯টি দেশ ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে মিলিত হয়েছিল। বান্দুং সম্মেলনে দশটি সাধারণ নীতি গৃহীত হয়, এগুলির মধ্যে ছিল মৌল অধিকার রক্ষা করা, সার্বভৌমত্ব, সবজাতির সমান অধিকার মেনে চলা, অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, জাতিপুঞ্জের সনদ মেনে চলা এবং কোনো শিবিরে যোগ না দেওয়া। অন্যান্য নীতি হল অন্যদেশের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করা, শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসা করা, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলা এবং আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব পালন করা। এগুলির মধ্যে পঞ্চশীলের নীতিগুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু হলে বিশ্ব নেতাদের অনেকে একে ভুল বুঝেছিলেন। সমকালে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেস ও পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেছিলেন যে জোটনিরপেক্ষতা হল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনৈতিক, জাতিপুঞ্জ সনদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতারা কখনও একে নেতিবাচক বলে মনে করেননি, বরং ইতিবাচক বলে গণ্য করেছিলেন। নিরপেক্ষ দেশগুলি সুইজারল্যান্ডের মতো নিরপেক্ষ নয়, বিশ্বরাজনীতিতে জোট খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। অনেকক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল। কোরিয়া, সুয়েজ, কঙ্গো ও ইন্দোচিনে ভারত বিরোধ মীমাংসায় বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল, একে কিছুতেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বলা যায় না। বলা হয়েছে নির্জোট আন্দোলন হল একটি কূটনৈতিক কৌশলমাত্র, কোনো নীতি নয় (Non-alignment is more a technique than a policy)। ভারতের জোটনিরপেক্ষতা সাময়িকভাবে সুবিধালাভের একটি কৌশল নয়, ব্যবস্থা নয়, ভারতের রাজনীতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এটি হল সংগতিপূর্ণ। জোটনিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কে সমালোচকরা বলেন ঠান্ডা যুদ্ধের পরিবেশে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল, এক মেরুর বিশ্বে, শান্তির সময়ে এর প্রয়োজন নেই। নির্জোট আন্দোলনের নেতারা এর উত্তরে বলেছেন যে বিশ্ব রাজনীতির পরিস্থিতি অনুযায়ী এই নীতি সামঞ্জস্য করে চলবে।

পঞ্চাশের দশকে ঠান্ডা যুদ্ধের পরিবেশে নির্জোট আন্দোলন খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমনে এর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। কোরিয়া ও ভিয়েতনামে ভারত আন্তর্জাতিক কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছিল। ভারত মিশর ও যুগোশ্লাভিয়া অন্যান্য দেশকে নির্জোট আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহ জুগিয়েছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির বেশিরভাগ নির্জোট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, ব্যতিক্রম হল পাকিস্তান। নির্জোট আন্দোলনের নেতারা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বেলগ্রেড শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়, এই আন্দোলনের নীতিগুলিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে এই আন্দোলনের দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী শান্তিপূর্ণভাবে সব আন্তর্জাতিক বিরোধ মেটানোর পরামর্শ দেন। আন্তর্জাতিক বিরোধে জোটবদ্ধ হয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রস্তাব দিয়েছিল ইন্দোনেশিয়া। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সাম্প্রতিককালে নির্জোট আন্দোলন অর্থনৈতিক উন্নতি ও সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছে, তবে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন এবং জোট বাঁধার রাজনীতির সে বিরোধিতা করে চলেছে। নিরপেক্ষ নেতাদের ধারণা সামরিক চুক্তি কোনো আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করে না, বরং উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সম্পাদিত

বাগদাদ চুক্তি, সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তি মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়াতে উত্তেজনা বাড়িয়েছে, যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এজন্য জোটনিরপেক্ষ নেতারা এসব চুক্তির সমালোচনা করেছেন। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আজও বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয় আছে। মাঝে মাঝে এর কর্মসূচির পরিবর্তন হয়, লক্ষ্যও পালটে যায়। ঠান্ডা যুদ্ধ নিয়ে জোট আজ আর মাথা ঘামায় না। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সম্পর্ক অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, উত্তেজনা কমেছে, নির্জোট আন্দোলন রাজনীতি থেকে অর্থনীতির দিকে ঝুঁকেছে। ভারত আর এই আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনে নেই, অন্য দেশ ও অন্য নেতারা এর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে ভারতের বিদেশনীতির একটি স্তম্ভ হল এই জোটনিরপেক্ষতা, এই নীতি ভারত আজও অনুসরণ করে চলেছে।

সোভিয়েত রাশিয়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে শান্তির রক্ষক বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কেনেডির শাসনকাল থেকে নির্জোট আন্দোলন সম্পর্কে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে যায়। আগের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্জোট আন্দোলনের বিরোধী নয়। একথা ঠিক নির্জোট দেশগুলির মধ্যে বহু বিষয়ে অমিল আছে, দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ভিন্ন ধরনের, তা সত্ত্বেও এই দেশগুলি উপলব্ধি করেছে জোটনিরপেক্ষতা হল বিভক্ত বিশ্বে যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। এই আন্দোলন বিশ্বে ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্য, কোরিয়া, ভিয়েতনামে মার্কিননীতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। জোটনিরপেক্ষতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা কমিয়ে দাঁতাত (dentente) নীতি বা সমঝোতার নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। নির্জোট আন্দোলন আজও তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছে, বিশ্ব শান্তিরক্ষায় এর ভূমিকা সব রাষ্ট্রনেতাই স্বীকার করে নিয়েছেন।

২২.৫ কাশ্মীর সমস্যা